SEM - 4
CC - 8, মডি - 3

১

শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত 'বাল্যলীলা' পর্যায়টির পরিচয়ঃ

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে শাক্তপদেও বাল্যলীলা তথা ব্যবহারিক রসের পদ লেখা হয়েছে। বৈষ্ণবের যেমন যশোদা-কৃষ্ণ, শাক্তের তেমনি মেনকা-উমা। এক্ষেত্রে মা ও সন্তানের ব্যবহারের সাথে সাথে বাল্যলীলার পদ লেখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও বাল্যলীলার পদ অত্যন্ত উপভোগ্য। বৈষ্ণব কবিরা গুরু হিসেবে রাধার মিলন-বিরহের বর্ণনায়, আর শাক্তকবিরা বিশেষত মেনকা উমা ও মা মেনকার বিরহ মিলন রচনায় এত গুরু হয়েছেন যে, উমার বাল্যলীলার পদ-গুলো খুব একটা রচনা করেননি। কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে উমার বড় হয়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছিলেন। শাক্ত কবিদের চোখে উমা হয়ে ওঠেন বাঙালি ঘরের আদরিণী মেয়ে।

তবে বাল্যলীলার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। বাল্যলীলায় মাতা ও সন্তানের যে সম্পর্ক, সেখানে একটি অন্তরঙ্গ মানুষিক ভাবই বেশি-প্রকাশিত হয়। মা যদি বলেন, তাঁর মেয়ে সামান্য নয়, সে ত্রিভুবনের মহাশক্তি, তবে মেয়ে সম্পর্কে মায়ের মনে ব্যঙ্গ ভাব জাগে না। জাগে ভক্তের ভক্তি। তাই শাক্ত কবিকে একটু সচেতন থাকতে হয়, মা যেন উমাকে মেয়ে হিসাবেই দেখেন, শক্তিদেবী রূপে নয়। যদি কোথাও এর বিপরীত ঘটে, তবে সেখানে পদের মানুষিক ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন রামপ্রসাদের একটি পদে তিনি লিখেছেন-

"আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি গেলেরি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি কহিতে লাগিয়ে।
ওরে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ উমা তাদের মস্তকে রয়।"

এখানে মেনকা গিরিরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাদের উমা সামান্য মেয়ে নয়। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ শিবের তিনি মস্তক বিহারিণী। শুধু যোগীন্দ্রগণও মুনিগণ তাঁকে পায় না।

তাঁকে গিরিরাজ - চাঁদ - দুলাল কন্যারূপে পেয়েছেন - এই ভাবে নিজ কন্যাকে তাঁর সেবাবঞ্চিত জীবন বর্ণনা করেন এই বাল্যলীলার পদ রূপে গড়ে উঠে।

বড়ু রামপ্রসাদের আরো একটি পদে বাল্য লীলার যে বর্ণনা আছে তা অনেক বেশী মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। রাত্রি কালে গিরিরাজকে অনুযোগ করে বলছেন মেনকা - "গিরিবর আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।" ক্ষেপা উমা সেদিন হঠাৎ করে অভিমান প্রকাশ করেছে, সে ক্ষীর - সর - নবনী কিছুই খাচ্ছে না। কারণ আকাশে চাঁদ উঠতে দেখে উমা সেই চাঁদকে হাতের মুঠিয়ে পাওয়ার জন্য জিদ করেছে। সে মাকে বলেছে - 'ধরে দে উমারে।' কিন্তু চাঁদকে তো ধরে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মেনকা এখানে নিজের অসম্মতি জানিয়েছে। কেঁদে কেঁদে উমার মুখ মলিন হয়ে গেছে। এ দুঃখ সহ্য করতে পারছেন না মা। তিনি যখন মেয়েকে বোঝান - "চাঁদ কিরে ধরা যায়" - কিছুতেই উমা সেকথা বিশ্বাস করতে পারেনি। তবু; সেও উতলা হয়ে মা কে বলেছে। তখন পিতা গিরিরাজ সমস্যার সমাধান করলেন এই বলে - "উঠে এস গিরিবর যাব আজ সমরে। নৌরীরে লইয়া কোলে করে। লইয়া দিল করে।" চন্দ্রবদনা উমা দর্পণে নিজের চাঁদমুখ দেখলেই তো চাঁদ তার হাতে ধরা দেবে। এই বলেই গিরিরাজ উমার হাতে আয়না ধরে দিলেন।

তার আকাঙ্ক্ষিত উমার বর্ণনায় কবি লিখলেন - "মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ। বিনিন্দিত কোটি শশধরে।" এখানে গতি রোধ অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন কবি। কোটি শশধরকেও নিন্দা দিচ্ছে উমার চন্দ্রমুখ। এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে ভারতচন্দ্র কবিত বিদ্যার রূপ বর্ণনা - "যে লাগে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।" পদের কবিতায় কবি উমাকে চন্দ্রকলা রূপে বর্ণনা করেছেন। এরপর, উমার সমন্বিত রূপাঙ্কনের মধ্যে বাল্যলীলার এই সুন্দর দিকটির সমাপ্তি টানলেন কবি।

শাক্ত পদাবলী — ' '

২। দুঃখের আকুতি-তে দুর্দশাক্লিষ্ট বাঙালীর ছবি —

শাক্ত পদাবলী-বিশেষজ্ঞের সমাজ সাহিত্য, সমাজ ক্ষেত্র ও কাল, সমাজের ও গীতিভূমি। অষ্টাদশ শতকের একটি বিশেষ সময় এই শাক্তপদ উদ্ভবের। শাক্তপদাবলীতে বিশেষজ্ঞের অষ্টাদশ শতকের দুর্দশাক্লিষ্ট বাঙালী-জীবনের ছায়াপাত ছিল। যেমন এক ঘোরতর অমাবস্যার সময় ১৭০৭ খ্রীঃ-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সেনাপতি জুলফিকার খাঁর ষড়যন্ত্র ও রণপাণ্ডের কুটিল ছায়া বাংলার নবাব তখন মির্জা উল্লা, তাঁর ঘিরেও রাজ্যলোভী আমীরদের ষড়যন্ত্রের কালছায়া।

এমনি সময় ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে ধলা শ্বেত বণিকদের পদসঞ্চার। বণিকের বেশেরা দুঁদে-দেশে যারা ভারত শাসনের রাজদণ্ডটিকে তুলে নিতে উদ্যত। ক্ষুদ্রবাণ রাজনৈতিক পরিবেশের এই দোলাচলতায় বাঙালী-কবিরা যেন হয়ে গিয়েছিল বেসামাল। প্রকৃত এখন আর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বাঁশী-তাদের বাঁধাতে পারে না। সেকালের শ্মশান ভূমিতে তাই মহামায়ার ঝাঁকরন চাই। কিন্তু যেমন বিপদ পড়লে মানুষ ডাকে, এই সময়ের বাঙালী-কবির কাতরোক্তি তেমনই রইল মাতৃনামের আশ্রয়। কবিরা বেশ বেজে বলেছেন- 'মা আমার ঘুরাবি কত। কলুর বলদের মত।'

আমাদের বাঙালী-কবিরা তখন যে মতীন্দ্র ভীতি ও দুর্দশার মধ্য দিন কাটাচ্ছিলেন। তখন তাঁদের পায়ের তলায় নিরাপত্তার কোনো জমি নেই। মুখের দাঁড়িয়ে তখন দুর্ভিক্ষের পাঁকভূমি। সেই সময়ের পরিবেশের শূন্যতাও হতাশা কবিকে ঘিরে লিখিয়ে নিল- "কেবল আসার- আসা ভুর আসা আসা সার হলো।" তবু নৈরাশ্যে কাঙালপেরা এমনি ভাবে না, দুর্দশার যে কয় মধ্যে এই গান মুখরিত হয়ে উঠে ছিল দুঃখ হয়ে- মহামায়াতে।

বিশ্বাস ভৈরব-আকৃতি, র- মূর্তিই এই দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালী জীবনের ছবি হয়ে উঠেছিল। তখন এমন এক অসহায়তা-মমতা, যখন রামের নিজেই অসহায়ের অধীন, তখন প্রেমের কাছেও সে অসহায় হয়ে ওঠে। তখন শ্রেষ্ঠ নামের জিত হয়। অসহায়ের সর্ব-সুখী-দাতা সেজেছে দেশ-জুড়ে। রামপ্রসাদের সাধন-তত্ত্ব হয়েছে আর্তজনের স্বভাব, হয়েছে অসহায়ের উপেক্ষা। -বিভিন্ন, আসামী-হাঙ্গর, দরখাস্ত, উকিল, ডিসমিস, সওয়াল হয়ে সব আদালত সম্পর্কিত ভাষাগুলি তখন ভৈরব আকৃতির সাথে মিলেই সেকালের বাঙালীজীবনের রূপক হয়ে উঠেছে। রামপ্রসাদ যখন বলেন, 'ছেলে অসহায়ের অসহায়ের পড়ে ধরলে দুধের বিনি-দাবি।' কথার মধ্যে খাটি হয়ে ওঠে- 'মা'র জন্য প্রেম আসল অসহায়ের ছবি।

সমাজ ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কবিকে পীড়িত করেছে। সামান্য পান-বিক্রেতা কৃষ্ণপান্তি হালদারী পেতে পারে, আর মাতৃ সাধক কবি শেষ দাম দরিদ্রে নিমন্ত্রিত। এইজন্যই কবি বারবার অভিযোগের কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে কবি লেখেন- "পান বেচে ধনী কৃষ্ণপান্তি তাই দিলে হালদারী, আমার দিনের বেলায় বাসায় জুড়ে আছে রামদুলারী।" সমাজ ধনী দরিদ্রের পার্থক্য কবিকে তখন পীড়িত করেছে। এই অসাম্য-তখন সমাজের সত্য। কবি এখানে দারিদ্র্যকে তুলে ধরেছেন। মজার কি না 'মা'কে তিনি আশ্রয় করেছেন, সেই মায়ের ঘরবাসে এও তিনি আর-ভরসা রাখতে পারছেন না। অনেক দুর্দশায় ভুগে মানুষ তখন আর-দুর্দশাকে অদৃষ্ট বলেই মানতে পারছে না। সে সমাজের অবিচার-নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই বোধ আসলে সমাজ যুগেরই ইঙ্গিতবাহী। কাব্য পদাবলী-তত্ত্ব হয়ে ওঠে সেকালের সমাজের প্রতিচ্ছবি।

—x—

৪। ভক্তকবিদের আকুতি কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে পৌঁছেছে দেখাও।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয়েছিল সাহিত্যধারা। এরই অন্তর্গত পদাবলি ভক্তের আকুতি। অদ্ভুত পাঠ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ভক্তের আত্মনিবেদন বা আকুতিই এখানে শেষ কথা নয়। এর মধ্যে সমাজচিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে, তাছাড়া দেবতার মানবায়নও এখানে বড় কথা। আদ্যাশক্তি মহামায়াকে ভক্ত এখানে ধরার কন্যা রূপেই কল্পনা করে নিয়েছেন। কবি যেন শিশুর মতো তাঁর সঙ্গে লীলায় রত। অভিযোগ-অনুযোগ-ভৎর্সনা যেন সার্থক কবি এখানে নিজের অন্তরের কথা পৌঁছে দিয়েছেন মায়ের কাছে।

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের তথা কবির কণ্ঠও বিষাদের সুর। তাঁর আশা করে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। অথচ পরিচিত জীবনের চক্রান্ত নৈরাশ্যের ফাঁদে পড়ে তিনি বুঝেছেন, এ জীবন যেন ছবির আঁকা পাখিদের মতো সৌরভহীন। সুতরাং শিশু যেমন বিপদে পড়লে প্রথম মা-কেই স্মরণ করে, কবিও তেমনি বিশ্বজনীন মহাশক্তির কোলেই আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। মায়ের ওপর অনুযোগেরও অন্ত নেই কবির, মাই যেন ফাঁকি দিয়ে তাঁকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জীবন সন্ধ্যায় তিনি যেন আবার তাঁকে কোলে তুলে নেন, এটাই কবির কামনা।

ভক্ত কবি এখানে সমাজতত্ত্বকিও। তিনি সমাজ পরিদর্শক। তাই উপমার জন্য তাঁকে শেষ রাত্রি ছুটতে হয়না। নিজের বৈচিত্র্যহীন, নৈরাশ্যময় জীবনের উপমা হিসাবে তাই তাঁর মনে পড়ে শ্মশের বলদের কথা, অতি আলস্যে তিনি বলে ওঠেন - 'মা আমায় ঘুরাবে কত/ কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত/ ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা/ পাক দিতেছ অবিরত/ তুমি কি দোষে করিলে আমায়/ ছুটা কলুর অনুগত।' কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও মাৎসর্য এই ছ'টি প্রবৃত্তি শাসিত মানবজীবনকে কবি এখানে কলুর বলদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এমন অন্তিম লগ্নে উপস্থিত। তাই হয়তো আমাদের মতো দেবতার দূত কিশোর তথাকথিত মানুষের মতো এসে জাগিয়ে তুলেছে। কবির মন যেমনই সমাজ দিকনির্দেশ করেছেন তিনি। মায়ের প্রতি অভিমান প্রকাশ করেছেন তিনি। তবুও ছবির যে জীবন তাও বুঝেছেন তিনি। সুতরাং অনুযোগ, অভিযোগ প্রকাশ হয়েছে তিনি

মা - যেও বুঝিয়ে দিয়েছেন - 'তত্ত্ব বিনা এই
এই - সংসার অসারি/ ও মা তুমিও খেলা করছ
বলিয়ে শিব ভিখারী।' তাছাড়া যেন যে এই
সংসারে যেটি গরী, যেটি দরিদ্র - এই ভাবনাও
কবিকে অধীর করে তুলেছে।

তবে অভিমান - অনুযোগ - সংশয় সমস্ত কিছুকে
পেরিয়েও দেখেন কবি। রামপ্রসাদ - সেনের উপচারও
পদগুলিতে আমরা যে নৈরাশ্য, নীলাম্বরবাবা, কেননা
ব্যক্ত হতে দেখেছি, সেখানেই আবার যখনেনি তিনি
বড় লোকের হিসাব রক্ষক - হতে নিচে তিনি গ্রহণ করে
দিলেন মাতৃকৃপার হিসাব রক্ষকের পদ। স্বীকার করে
নিলেন মায়ের কাছে - 'আমার যেও মাতৃকিঙ্কর
আমি নিমকহারাম নই মা সরকারী/ পদরত্ন হেন্তর
সকলই লুটে হয় আমি সইতে নারি।' শেষ পর্যন্ত
বিনরত্নকে অঙ্গীকার করে মায়ের পদরত্নকেই আশ্রয় করেছেন
কবি। সমস্ত দেখাদেখি - হলে মানে সংসারের সত্য দর্শন
করেছেন কবি রামপ্রসাদ সেন। 'মা বিরাজে সর্বঘটে' - এই
প্রত্যয়ে স্থিত - হয়েছেন কবি। তেমন আর কোনো অভিমান -
অনুযোগ নয়, কবি অন্যরকম আত্মনিবেদিত এক দিনের
কল্পনা করে লিখেছেন - 'এমন দিন কি হবে তারা। যত
তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।' এইখানেই
ভক্তের আত্মতির পরিণাম মধুর হয়ে ওঠে। নীলকণ্ঠের সমস্ত
তিক্ততা হলে কবি সুখ পেয়েছে হলে আত্মনিবেদনের
মাধ্যমে ছুঁয়ে নিতে চেয়েছেন তেমন। 'হৃদিপদ্ম ওঠে যে ফুটে'
মায়ের অঙ্গের ঘামে ফুটে' - এক পরম শান্তির আলোয়
উদ্ভাসিত হতে মন। আর তখনই যে সমস্ত দেখাদেখি ঘুচিয়ে
কবি পৌঁছে যাবেন ধর্মসমন্বয়ের এক অপরূপ লোকে।
যেখানে শ্যাম ও শ্যামা অভিন্ন। সেখানে শ্যামাকেই -
বংশীধারীলালের শ্যামরূপেদেখতে পান কবি। এই উদার তত্ত্ব
ভক্তের আত্মতি যে বিসর্জন দিয়েছে। এই সুখই - মনারমশ
বা নৈরাশ্যমথিত - নীলকণ্ঠের নয়, দুঃখজেনার সুখ তাপে
এক বৃহত্তর মুক্তিপথে উত্তরণের ইঙ্গিতও রয়েছে এখানে।

-x-

5 Marks

শাক্তপদাবলী —

১. ক্ষ্যাপার বাবা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম বাড়ি,
ঐ যে পাপ যেতে চায় কৃষ্ণ পাপ্তি তার দিলে বাসাবাড়ি।

আলোচ্য পদাংশটি কবি রামপ্রসাদ সেনের। ভক্তের আকুতি পদটির পদে পদে সঞ্চালিত। এই কায়া-মোহ জড়িত সংসারের কবি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছয় রিপু দ্বারা চালিত। কৃষ্ণচন্দ্রকে কবি এখানে এই ছয় শত্রুর অন্যতম বলেছেন। রূপকের ভাষায় ছয় রিপুকে কবি এখানে পেয়াদা সাব্যস্ত করেছেন। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে অর্থাৎ দেহ মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কবি নিরাপত্তা নির্ভয় থাকতে দান গ্রহণ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়া আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রস্তাবে রাজি হতে পারেননি।

কবি রামপ্রসাদ সেন যে তাঁর সময়ের সচেতন কবি ছিলেন, তিনি এখানে কেবল পাপ্তি ছিলেন। এই সময়ের ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নানা অসাম্য রয়েছে। কৃষ্ণ পাপ্তির মত সাধারণ মানুষ এখানে পাপ্তিক্রমে দেহ জমিদার হয়ে যায়, আর কবি যারা নীলকর সাহেবের নাম সাধারণের কাছে ধিক্কৃত হন - এই অসাম্যের দোষ কবিকে এখানে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

—x—

২. আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবার লুটে-
খাই আমি সইতে নারি॥

আলোচ্য পদাংশটি কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত ভক্তের আকুতি পদের দেহ সঞ্চালিত। এই পদটি রামপ্রসাদের একটি ইতিহাস আছে। কোনো এক কাল্য ধনীর বাড়িতে হিসাব রক্ষকের সামান্য কাজ নিয়েছিলেন কবি। কিন্তু মাতৃ সাধক কবি পার্থিব হিসাবে রত থাকতে পারেননি, তিনি মায়ের করুণা ভাণ্ডারের হিসাব রক্ষক হতে চেয়েছেন এবং নিমকহারামি করতে না পেরে চাকরি ছেড়েছেন। মায়ের পদাশ্রয়ে শান্ত কৃপা লাভেই পেতে পারে, কবি এতে লক্ষিত থাকবেন, এতে হতে পারে না। তাই কবি মায়ের করুণার হিসাব রক্ষক হতে চান। 'তবিলদারী' বা 'নিমক-হারামি'র মত শব্দ এখানে প্রযুক্ত হওয়ায় তৎকালীন কর্মসংস্থান ব্যবস্থার দিকটি স্পষ্ট।

—x—

৩. এ দুঃখ কি প্রমাণ সয়
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।

আলোচ্য কাব্যাংশটি কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত আগমনী পর্যায়ের পদ। মেনকার উক্তি। প্রতিবছর উমার অতি ক্ষুব্ধ মেনকা হারালেন যে উমাকে কয়েকদিনের জন্য তার কাছে আসেন। আবার তাকে চলে যেতে হয়। তাই মেনকা এবার ঠিক করেছেন উক্তির মধ্য দিয়ে কবি মেনকাকে সমর্থন করে বলছেন যে, শিব যদি শ্মশানে মশানে না ঘুরে একটু ঘর সংসারের কথা ভাবতেন, তবে মেনকাকে এমন কথা বলতে হত না। এই ভাবে কবি এখানে উমা-জননীর দুঃখের শরিক হয়েছেন।

—x—

৪. তব দেহ যে পাষাণ, এ যেহে পাষাণ প্রাণ-
এই হেতু এতখন না হল বিদার।
তলয়া পাষাণ তনি বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।

আলোচ্য কাব্যাংশটি কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত বিজয়া পর্যায় থেকে সংকলিত, এটি মেনকার উক্তি। মেনকা এখানে কন্যা উমাকে পুনরায় দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু উমাহীন গিরিপুরী তখনো উমাকে আনতে যান না। এইজন্য মেনকা গিরিরাজকে পাষাণ হৃদয় বলে অনুযোগ করছেন। গিরিরাজের হৃদয়ে কন্যার প্রতি মায়া নেই বলেই তিনি এমনটি করছেন, এটিই মেনকার ধারণা। নতুবা কন্যা বিহনে গিরিরাজের চিত্ত হাহাকার তো এতদিনে বিকীর্ণ হবার কথা ছিল। কিন্তু বিজয়ার নিষ্ঠুর পাশে দাঁড়িয়ে মেনকা বুঝতে পারছেন, গিরিরাজের মত তিনিও পাষাণ হয়ে গেছেন। তবে এই মেনকা সবার সচেতন। একদিন প্রথম আবেগের মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, এবার উমা পিতৃগৃহে এলে আর তাকে যেতে দেবেন না। কিন্তু এখন তিনি বুঝলেন, মেয়েকে যতই কষ্ট দেওয়া হোক না কেন সংসার থেকে তিনি নিজের কাছে এনে রাখতে পারবেন না। তবু স্নেহ পীড়িত জননী হিসাবে তিনি যে কতটা অসহায়, বিধাতার প্রতি অভিযোগে এখানে তা প্রকাশিত হয়েছে।

—x—

৫. বরঞ্চ তাহারে মান ধনের বাঁধনে দমী।
তথাপি মূল্যবান রতন উমা মোর॥

আলোচ্য কাব্যাংশটি কেলাসজন্য ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের পদ গিরিরাজের উক্তি। মেনকার বারংবার গিরিরাজের কাছে উমাকে এনে দেবার অনুরোধ হাসিমুখে গিরিরাজ ফিরিয়ে দিত। উমার অভিমান হবার ভয়ে এই উক্তিটি করেন। হয়ত একথা বলে গিরিরাজ মেনকাকে সান্ত্বনা দিতেই চেয়েছিলেন। মেনকা যদি দুঃখে কাতর হন, তবে তিনি যদি হতেন তার মেয়ে সুখে আছে, তবে তিনি আর দুঃখিত হতেন না, কিন্তু উমার অমঙ্গল দেখাতে গিয়ে গিরিরাজ এখানে একটি প্রতিবেদ অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। মা-বাবার মনকে বল দিয়ে তারা, সম্পত্তি কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু আদরের রত্ন স্বরূপা উমাকে দূরে রেখে শূন্য পাষাণ-কারা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেনা। অর্থাৎ এখানে মনিহীন সর্পের তুলনায় উমাহীন কিশোর দুঃখের অতল গভীরতাই মূল ধরা হয়েছে।

—x—

৬. আতি অবোধ নিশু - সমান উমা মোর —
বলে উমা চড়ে যে উমেদার।
চাঁদনিয়ে দেখালে আঁখি মলিন ও মুখ সেও
মরে যায় সহিতে কি পারে।

আলোচ্য কাব্যাংশটি রামপ্রসাদ সেন রচিত শ্যামা বিষয়ক পদ থেকে গৃহীত। উমা এখানে মেনকার নীলকান্ত মণি-রূপে গৃহীত। সে অবোধ শিশু-কন্যা। শিশু সুলভ অবুঝপনায় সে অসম্ভব জেদ ধরে চাঁদ চেয়ে বসে। মায়ের কাছে সে চাঁদ চাই। কিন্তু মোটেই ঐ চাঁদটি তাকে পেড়ে দিতে হবে। কিন্তু মোটেই উমার অসম্ভব নয়। অতএব চাঁদ না পেয়ে উমা ছেঁচে-ছেঁচে কেঁদে ভাসিয়েছে আর উমার অশ্রু মলিন মুখ দেখে মায়ের দুঃখও এখানে অপার হয়ে উঠেছে।

—x—

৭. আনন্দে করি হে হাসি ঘর মা এই লও শশি -
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

আলোচ্য পদাংশটি কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত উমার বাল্যলীলা থেকে সংকলিত। উমা এত রূপে আকাশের চাঁদ-কেও প্রবল হেরে চাঁদ হে। উমার কান্না থামাতে না পেরে তাকে উমার সামনে একটি দর্পণ-ধরা হল। সেই দর্পণে নিজের মুখ দেখে উমা যেন আকাশের চন্দ্রকেই হারাতে পেল। সুতরাং বালিকা উমার অত্যন্ত কান্না থেমে গেল। সে সুখী হল। এখানে কবি একটি ব্যতিরেক অলংকার প্রয়োগ করেছেন। উমার মুখের সৌন্দর্য এখানে আকাশের কোটি চন্দ্রকে নিন্দা দিচ্ছে। সুতরাং উমার মুখের সৌন্দর্য কোটি চন্দ্রের অধিক। এভাবে কবি এখানে উমার রূপ বর্ণনা করেছেন।

—x—

৮. এস আমামী - দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলি মা ফিরে, আমারই করি/
আমার ইহা করে ঐ দুয়ারেতে কিছু ধাওয়াইয়ে প্রাণে মরি।

আলোচ্য পদাংশটি কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত। এতে আগমনী, উমার পদ-প্রেম সংকলিত। কবি এখানে প্রকৃতি-পালিকা জননী মাতৃরূপে কথা ভেবে মায়ের কাছে অন্তরের আকুতি নিবেদন করেছেন।

তিনি এখানে নিজেকে 'আমামী' বলে উল্লেখ করেছেন। দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলতে বোঝানো হয়েছে মানব মনের দ্বিধাগ্রস্থ প্রবৃত্তিকে, এগুলি হল কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও মাৎসর্য। কবি এই সংসারের উপরোক্ত প্রবৃত্তির দ্বারা অসহায় বোধ করছেন। তিনি নিষ্কাম, নির্লোভ, অক্রোধী, ঈর্ষাশূন্য, মমতাশূন্য হতে চান। কিন্তু এই সংসারচক্র তাঁকে বাঁধা পড়ে রেখেছে। এইভাবে প্রকৃতি থেকে মুক্তিকামী কবির আর্তিমাখা কণ্ঠস্বর এখানে দূরে উঠেছে। আমামী ও দুয়ারের রূপক ব্যবহার করে এই শক্তিশালী অর্থাৎশ শাক্তের বিশ্বাস ও অন্ধ অবস্থাকে নিজের মননেরও পরিচয় দিয়েছেন।

—x—